The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 127-142, ISSN 2306-3920

যতীন সরকারের *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন* : অবিভক্ত ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনীতি-প্রসঙ্গ

মোছা. আমিনা খাতুন*

[**সার-সংক্ষেপ :** ব্রিটিশ শাসকদের প্ররোচনায় মুসলিম লীগের কামনায় ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজন ঘটে। ১৯৪৭-এর পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী শাসকদের কর্তৃত্বের সূচনা ঘটে। তারা উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে। ফলে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় মুসলমান বাঙালির জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠে। রাষ্ট্রক্ষমতায় বাঙালিকে বঞ্চিত করার জন্য মুসলমান বাঙালি অবাঙালি মুসলমানদের থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় পৃথক হয়ে আসে। এভাবে সম্পূর্ণ ষাটের দশকে পাকিস্তানী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে বাঙালি ভাবাদর্শের সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। যতীন সরকার দেখান, বাঙালির এই সংগ্রাম একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যেতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালে একটি গণঅভ্যুত্থান ঘটে– যা মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে। যতীন সরকার মনে করেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের বিজয় সূচিত হয়েছে। রাজনীতি প্রসঙ্গে যতীন সরকারের এসকল বিবেচনাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।]

ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনীতির নানামাত্রিক টানাপড়েনের মধ্যে বেড়ে ওঠে মানুষ। সময়ের বিচিত্র সংকট তাঁর চৈতন্যকে, বোধকে ঋদ্ধ করে। দেখার ও অনুভবের নিজস্বতার কারণে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র মাত্রায় অভিষিক্ত হয়। অনুভূতি-প্রবণ ও সৃষ্টিশীল মানুষ তাঁর প্রগাঢ় অভিজ্ঞতাকে কখনো কখনো প্রকাশের ব্যাকুলতা অনুভব করে। নিজের ভেতরের তাড়নাকে ভাষায় মূর্ত করে তোলার জন্য তাঁর মধ্যে বিশেষ তাগিদ সঞ্চারিত হয়। তখন তিনি তাঁর বিবেচনাকে, বিশ্বাসকে এবং জীবন-জগৎ-কাল সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধিকে নিজস্ব শৈলীতে প্রকাশ করেন। ফলে যে-কোনো লেখকের ক্ষেত্রেই সমকাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক ঘটনাবলির টানাপড়েনের মধ্যে যাঁদের লেখকের মানস তৈরি হয়েছে– তাঁদের অন্যতম যতীন সরকার (জ. ১৯৩৬)।

জন্মেই যতীন সরকার দেখেছেন এক পরাধীন স্বদেশভূমিকে এবং এই পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল এক জনগোষ্ঠীকে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, মুসলমানদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রতি টান, হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক ও দেশত্যাগ– এসব তাঁর মধ্যে অল্প বয়সেই দগদগে অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং তাঁর কিশোর মনকে বিভিন্নভাবে আলোড়িত করে। পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে নানামাত্রিক সংগ্রামের পর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, বিশ্বপটভূমিতে বাঙালির বিরলদৃষ্ট অভিযাত্রার পরিচয়বাহী এক অনন্য দৃষ্টান্ত মুক্তিযুদ্ধ। দেশভাগ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন স্তরের

---

* **ড. মোছা. আমিনা খাতুন :** সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

আন্দোলন চরম আকার ধারণ করেছিল। ব্যক্তিজীবনে অসহনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করেও যতীন সরকার বায়ান্নের ভাষা-আন্দোলনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তীসময়ে এক বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পালাবদল পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তিনি বড় হয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্বপাকিস্তানের যৌক্তিক সকল আন্দোলন-সংগ্রামের সঙ্গে যতীন সরকার একাত্মতা অনুভব করেছেন, কখনো কখনো সক্রিয় অংশগ্রহণও করেছেন।

যতীন সরকার অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি। কিন্তু কলেজজীবনের প্রথম পর্যায় ব্যতীত আর কখনোই তিনি সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না হলেও সারা জীবনই তিনি তাঁর বিশ্বাসে, মনে ও মননে রাজনৈতিক একটি আদর্শকে লালন করেছেন। ফলে তাঁর জীবনাচরণ ও সাহিত্যে এই আদর্শবাদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থ বা প্রবন্ধসমূহে যখন তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের কিংবা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন তখন সেখানে রাজনীতির নানা প্রসঙ্গ তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান লাভ করেছে।

নেত্রকোনা কলেজে আই. এ. ক্লাসে পড়ার সময় সরাসরি ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ছাত্রলীগের রাজনীতি দিয়ে শুরু করলেও ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হবার পর কমিউনিজমের দীক্ষা নেন যতীন সরকার। পরবর্তী জীবনে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িত না থাকলেও জীবনে কর্মে, চিন্তায় ও লেখায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগ ঘটানোর প্রয়াস অব্যাহত রাখেন তিনি। নিজেকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী হিসাবে পরিচয় দিয়ে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন : 'কোন পার্টি করতাম সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে দর্শনটা, যেই দর্শনটা আমি গ্রহণ করেছি।' (স্বনাম গুপ্ত ২০০৯ : ২৬)। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রকে তিনি তাঁর জীবনের আদর্শ হিসাবে লালন করেছেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল। এজন্য তিনি রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিস্তার কামনা করেন। এ লক্ষ্যে যতীন সরকার সাংস্কৃতিক সংগ্রামকেও অপরিহার্য বলে বিবেচনা করেছেন।

মূলত *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন* (২০০৫) গ্রন্থের আলোকে যতীন সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। গ্রন্থটি লেখকের আত্মজৈবনিক রচনা হলেও এতে বিধৃত হয়েছে জাতীয় জীবনের একটি নির্দিষ্ট কাল পরিসরের রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাস। বলা যায় গ্রন্থটিকে ১০৯টি উপ-শিরোনামে ভাগ করে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সময়ের স্মৃতিচারণ করেছেন যতীন সরকার। বইটিকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ বলা না গেলেও গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসামান্য। এ গ্রন্থে পাকিস্তানের জন্ম, সাম্প্রদায়িকতার উত্থান, ৫২-এর ভাষা-আন্দোলন, ৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২-এর ছাত্র-আন্দোলন, ৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধ, ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৬৯-এর গণ-আন্দোলন, ৭০-এর নির্বাচন ও ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে লেখকের বিবেচনাসমূহ নির্মোহ দৃষ্টিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে লেখক ১৯৪৭ পূর্ববর্তী সময়ের দিকেও দৃষ্টিপাত করেছেন।

অবিভক্ত ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনীতি প্রসঙ্গে যতীন সরকারের বক্তব্যকে মূল্যায়নের সুবিধার্থে কালানুক্রমিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে যতীন সরকারের আলোচনার আলোকে তা বিশ্লেষিত হয়েছে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের উত্থান, বিকাশ ও পরিণতি ঘটে। সেসঙ্গে সাম্প্রদায়িক চেতনা বিস্তার লাভ করে। পাকিস্তান আন্দোলনের মূলে ধর্ম, শ্রেণিশোষণ ও রাজনীতি– এ তিনটি বিষয় প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সালের পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনীতি আলোচিত হয়েছে। পাকিস্তানি শাসকদের কৌশল ছিল হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টি করে পাকিস্তানি শাসন প্রক্রিয়া চালু করা। কিন্তু ১৯৪৮ সালে জিন্নাহর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান ও অবাঙালি মুসলমানের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এর বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা জেগে উঠতে থাকে। পাকিস্তানি স্বৈরশাসক হিন্দু-

মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উস্কে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করে। তৃতীয়ত, ১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভাষা-আন্দোলন, ৫৪-এর নির্বাচন, ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চতুর্থত, ১৯৫৯ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর বিরোধিতা, পাক-ভারত যুদ্ধ এবং এই ঘটনাগুলোর বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শের আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান গড়ে ওঠে। এই অভ্যুত্থান মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে। পঞ্চমত, মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটনাসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে জাতীয়তাবাদী দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে রুশপন্থি সমাজতান্ত্রিক দলও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কালানুক্রমিকভাবে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে যতীন সরকারের ভাবনা মূল্যায়িত হয়েছে এই প্রবন্ধে।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হওয়ার অব্যবহিত পূর্বের বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার বিষয়ে যতীন সরকারের পর্যবেক্ষণ উল্লেখযোগ্য। আলোচনার পূর্বে ঐতিহাসিকভাবে বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা প্রয়োজন। একটি পৃথক জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিসাবে বাঙালিত্বের ধারণা প্রাক্-ব্রিটিশ যুগেই সূচিত হয়। ঔপনিবেশিক আমলে এই ধারণা স্তিমিত হতে থাকে, কিন্তু পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের স্বার্থের পরিপন্থি শাসনের ফলে তা পুনর্জীবন ও পূর্ণতা লাভ করে। (মোহাম্মদ শাহ ২০০০ : ৭১৩)। পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই বাংলায় একটি নতুন বাঙালি সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে– যা আকৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সংস্কৃতি থেকে আলাদা ছিল। (২০০০ : ৭১৬-৭১৭)। কয়েক শতাব্দী ধরে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত ও শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে থাকলেও উনিশ শতকে মুসলমান সংস্কারকরা বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-ভাবনা থেকে অমুসলিম ভাবধারা বহুলাংশে কমিয়ে আনার চেষ্টা করে এবং এ বিষয়ে সফল হয়। তবে একথা সত্য যে, অনেক আগে থেকেই মুসলমান বাঙালি সমাজে 'মুসলমান' না 'বাঙালি মুসলমান' এ নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। বাংলায় জন্মেও কারো কারো মনে ভাষার প্রশ্নে দ্বন্দ্ব কাজ করেছে। এদের উদ্দেশ্যে আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০) সপ্তদশ শতকেই বলেছিলেন :

> যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
> সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি॥ (আবদুল হাকিম ১৯৮৯ : ৪৭২)

সতের শতকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে বাঙালি মুসলমানের মনে এই ছিল দ্বন্দ্বের দৃষ্টান্ত। উনিশ শতকে যদিও বাঙালি মুসলমান তার চিন্তা-চেতনা থেকে বেড়িয়ে আসতে সক্ষম হয়, 'তবুও বাংলায় মুসলিম সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব ঘটতে থাকে। এর কারণ মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি আর সেটা বাড়তে থাকে তিনটি কারণে। প্রথমত, ইসলাম বিরোধী খ্রিষ্টান মিশনারী প্রচারণা; দ্বিতীয়ত, অতিন্দ্রিয়বাদ ও সংমিশ্রিত সংস্কৃতির প্রভাব এবং তৃতীয়ত, উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্ভব।' (মোহাম্মদ শাহ ২০০০ : ৭১৭)।

১৯৩৭ সালের পর থেকে পাকিস্তান আন্দোলনের কারণে বাংলার মুসলমানের মধ্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদী বিশ্বাস দৃঢ়তা লাভ করে। তাই বাংলার মুসলমানেরা পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করে। *বিচিত্রবিধ বিচার বিবেচনা* গ্রন্থের "নিহত নীলকপোত" প্রবন্ধে যতীন সরকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

> পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে এদেশের মুসলিম যুবশক্তির একটা বড় অংশ যে উদ্দেশ্যচেতনা নিয়ে জড়িত হয়ে পড়ে, হেকিম ভাইয়ের মধ্যে সে উদ্দেশ্যচেতনা বেশ সক্রিয় ছিল। জমিদার-মহাজনের শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে মুক্ত হয়ে এদেশের সাধারণ মানুষগুলো মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারবে– এ চিন্তা থেকেই পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি ছিল তাঁর সক্রিয় সমর্থন। (২০১২খ : ১৮৫)

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের উত্থান, বিকাশ ও পাকিস্তান আন্দোলনের বিস্তার ঘটে। এর পূর্বে বিশেষত উনিশ শতকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে হিন্দু-মুসলমান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেছে। এ বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষক শীলা সেন বলেন : 'Till nineteenth century Hindues and Muslims in Bengal lived side by side as peaceful neighboures but maintaining their separate individual and cultural identity and accepting each other as such.' (1976 : 22)। ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ঘটিয়ে জনমনে পাকিস্তান আন্দোলনের বীজ ঢুকিয়ে দেয়া হয়। বিশিষ্ট গবেষক এনায়েতুর রহিম তাঁর *বাংলায় স্ব-শাসন* গ্রন্থে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন : 'প্রাদেশিক স্ব-শাসন প্রবর্তনের ফলে, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণের বিরাট অংশে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের কারণে, রাজনৈতিক সেরাংশের নির্বাচনী অভিযানের ওপর ভর করে সাম্প্রদায়িক চেতনা গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হতে লাগলো। এই রাজনৈতিক সেরাংশের অনেকে অশিক্ষিত ভোটদাতাদের প্রভাবিত করার জন্য ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারকে কাজে লাগালেন।' (২০০১ : ১৪)। ঠিক এসময় পাকিস্তান আন্দোলনের কারণে বাংলা বিশেষত পূর্ববাংলার হিন্দুদের মনে এক বিশেষ ধর্মীয় সংকট দেখা দেয়। কারণ তারা সংখ্যায় ছিল কম। কিন্তু অধিকাংশ জমিদারশ্রেণির হিন্দু পূর্ববাংলায় বসবাস করত। অন্যদিকে হিন্দুদের ধর্মীয় রক্ষণশীলতা থাকায় পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাদের জীবন ও ধর্মাচরণ সংকটের মুখে পতিত হয়। ফলে পাকিস্তান জন্মের পূর্বে হিন্দুদের বিভিন্নমুখী ভাবনা ও সংকট দেখা দেয়। যতীন সরকার হিন্দুদের এই রাজনৈতিক ভাবনা ও সংকটের কথা বর্ণনা করেছেন।

পাকিস্তান আন্দোলনের কারণে মুসলমানেরা মুসলিম লীগ ও হিন্দুরা কংগ্রেসকে সমর্থন করে। অন্যদিকে মুসলমান বাঙালিদের অনেকে তখনো বাঙালি জাতীয়তাবাদ অঙ্গীকার করে বাংলায় বাঙালি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য কামনা করত। যতীন সরকার পাকিস্তান আন্দোলনকালে এই বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন। এই দুই সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক বিভাজনের মাঝখানে তখন বাংলায় সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি ক্ষীণ ধারায় ক্রিয়াশীল ছিল। প্রাবন্ধিক সেখানে এই রাজনীতির অবস্থান এবং কেন্দ্রীয় ও বিশেষ করে আঞ্চলিক কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিয়েছেন। পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রভাবে তৎকালীন পূর্ববাংলায় সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন বিশিষ্ট দিক উপস্থাপন করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলনের শেষে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান-ভারত বিভাজনের মাধ্যমে পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হল। ভারত বিভক্ত হবার পরেও পাকিস্তান রাষ্ট্র অবিভক্ত কেন থাকল না– এর বিভিন্ন বিশ্লেষণ বিবৃত করেছেন যতীন সরকার। বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় একটি দ্বান্দ্বিক অবস্থার মধ্যে মুসলিম সমাজের মানস-চিন্তা বিকশিত হয়। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তাদের এই চিন্তার এবং সেসঙ্গে সমাজের অপরাপর সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশেষ দিকগুলো *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন* গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রাবন্ধিক মনে করেন, চল্লিশের দশকের গোঁড়া থেকেই এদেশের গ্রাম এলাকার মুসলমানের মধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভাবনা আস্তে আস্তে দানা বাধা শুরু করে। ফলে পূর্বে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে যেখানে ঐক্য ছিল, সেটি রেল-লাইনের মত হয়ে উঠল। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের মন্তব্য : "কলকাতায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'র প্রধান সংগঠকরূপে আবুল মনসুর আহমদই বোধহয় সর্বপ্রথম এই উপাধিটি ব্যবহার করেছিলেন। এরপর থেকেই এটি বহুদিন ধরে ক্রমাগত ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।" (যতীন সরকার ২০০৫ : ১৭০)। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-বিশ্বাস একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। যতীন সরকার বলেন যে, এসময় বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের ধূতি-লুঙ্গি সংস্কৃতির ভেদ ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠে। '১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টের দাঙ্গা একটি ব্যাপার চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত করে দেয়, তা হচ্ছে– বাঙালি মুসলমানের ধূতি বর্জন।' (আবদুল হক ২০১৬ : ৭৪)। তাই চল্লিশের দশকেই দ্বিজাতিত্ত্ব চূড়ান্ত পরিণতি পায়। কিন্তু এ ধারণা উনিশ শতকে জন্মলাভ করে বলে

যতীন সরকার মনে করেন। তবে লেখক দ্বিজাতিতত্ত্ব উদ্ভবের পেছনে ব্রিটিশের ভেদনীতিকে দায়ী করেছেন। এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের পূর্ব পরিকল্পনা ছিল। গ্রন্থকারের এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত তথ্য নিম্নরূপ :

> এরও আগে, আঠারোশো বিয়াল্লিশ সালেই লর্ড এলেনবরো বলেছিলেন, 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের কাজে লাগাতে হবে'। আর আঠারোশো আটান্ন সালে লর্ড এলফিনস্টোন এদেশে 'ভাগ করে শাসন করা' প্রাচীন রোমান রীতি গ্রহণ করার জন্যে স্পষ্ট সুপারিশ করেছিলেন।... আরো পরে, আঠারোশো সাতাশি সালে, আরেক ভারত সচিব লর্ড ক্রসও সে সময়কার বড়লাটকে বলেছিলেন যে, 'এই ধর্মীয় মনোভাব আমাদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক।' (যতীন সরকার ২০০৫ : ১৭২)

কোথায়, কীভাবে ব্রিটিশ শাসকরা হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে– সে প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের অভিমত, প্রথমত ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের আলাদা রাজনৈতিক সংগঠন 'মুসলিম লীগ' (১৯০৬) প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান করেছে। দ্বিতীয়ত, পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতিকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছে। তৃতীয়ত, ১৯৪০ সালের পর ব্রিটিশ শাসকরা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে (১৮৭৬-১৯৪৮) মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) বিপরীতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মুসলিম 'মহাত্মা' হিসাবে দাঁড় করাতে চেয়েছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল (১৮৭৪-১৯৫৬) জিন্নাহর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে পাকিস্তান আন্দোলনকে চাঙ্গা করে তুলতে চেয়েছেন। (২০০৫ : ১৭৩)। এ প্রসঙ্গে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের (১৮৮৮-১৯৫৮) বক্তব্য : 'পূর্ববঙ্গ ততদিনে ভিন্ন প্রদেশ; সে সময়ের জঙ্গীলাট ব্যামফিল্ড ফুলার প্রকাশ্যেই বলেন যে, ব্রিটিশের চোখে মুসলিম সম্প্রদায় হলো তার সুয়োরাণী।' (২০০০ : ৪)। ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানরা নিজেদের আলাদা পরিচয় তৈরি করতে চেয়েছে। এরই ফল হিসাবে তারা লাহোর প্রস্তাব করেছে কিন্তু হিন্দুদের কাছে তা পরিচিতি পায় 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসাবে। যতীন সরকার বলেন, পাকিস্তান জন্মাবার আগে হিন্দু-মুসলমান বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং হিন্দুরা রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের পক্ষ অবলম্বন করে। ঠিক এসময় তৎকালীন পূর্ববাংলায় ভদ্র হিন্দুর মনে ধর্ম, জাত ও অর্থনৈতিক ভিত্তি হারানোর ভয় জেগে ওঠে। পাকিস্তান জন্মের পূর্বলগ্নে প্রাবন্ধিক মনে করেন, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের বিভেদ ঘটিয়ে পাকিস্তান আন্দোলন মুসলিম স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্ট করে তোলে এবং সাম্প্রদায়িকতার বীজকে উস্কে দেয়। মওলানা আকরম খাঁর (১৮৬৮-১৯৬৮) নেতৃত্বে নিখিল-বঙ্গ-প্রজা সমিতি (১৯২৯) গঠন করা হয়। এসময় থেকে শিক্ষিত মুসলিম সমাজে হিন্দু-বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) তাঁর *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (১৯৬৮) গ্রন্থে লিখেছেন : 'মুসলিম শিক্ষিত সমাজ সাধারণভাবেই এই সময়ে কংগ্রেস-বিরোধী, হিন্দু-বিরোধী, এমন কি দেশের স্বাধীনতা-বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে।' (২০১৫ : ৫১)।

যতীন সরকার জানান, পাকিস্তান আন্দোলনের বিপরীতে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে গুটিকতক মানুষ বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেছেন। বৃহত্তর ময়মনসিংহের নাসির সরকার, আবদুল ওয়াহেদ, মওলানা আলতাফ হোসেন ছিলেন ব্রিটিশ রাজত্বে মুসলমান জাতীয়তাবাদী নেতা। এই জাতীয়তাবাদী নেতারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধী ছিলেন। তাঁরা পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে সমর্থন করেননি। তাই পাকিস্তানপন্থিদের কাছে এঁদের অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আবুল কাসেম ফজলুল হকের মন্তব্য :

> পাকিস্তান আন্দোলনের পর পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যারা নেতৃত্বে ছিলেন– তারা সাম্প্রদায়িক এবং অসাম্প্রদায়িক দলে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম পর্যায়ে সাম্প্রদায়িকদের ভূমিকা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল এবং যারা অসাম্প্রদায়িক তাদের ভূমিকা ছিল

> প্রগতিশীল। সাম্প্রদায়িকরা পাকিস্তান আন্দোলনের আদর্শই প্রচার করেছেন আর অসাম্প্রদায়িকরা তা বিরোধিতা করেছেন। (১৯৭৩ : ১৩৫)

প্রবন্ধকারের মতে, পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন পূর্ববাংলায় বাঙালি মুসলমানেরা মুসলমান আত্মপরিচয়ে নিজেদেরকে আলাদা করতে চেয়েছে। ফলে মুসলমানেরা ভাষায়, বেশভূষায় মুসলিম স্বাতন্ত্র্যকে সচেতনভাবে দৃশ্যমান করার চেষ্টা করেছে। আর এর মধ্য দিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বকে সত্য করে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। শহুরে শিক্ষিত লোকেরাই ভাষা-কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতার সূচনা করে। পরে সে সাম্প্রদায়িকতা গ্রাম-গঞ্জে মন্দির-মসজিদ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

লেনিনের কথার সূত্র ধরে প্রাবন্ধিক বলেন, বাংলায়ও দুইটি জাতি– শোষক ও শোষিত। তাই সংস্কৃতিও দুইটি– শোষকের ও শোষিতের সংস্কৃতি। হিন্দু সামন্ততন্ত্র ছিল শোষক এবং প্রধানত মুসলিম প্রজা বা রায়ত ছিল শোষিত। বাংলায় শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের আর্থ-সামাজিক পরিণামও *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন* গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় অবাঙালি মুসলমান ও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্বটি ১৯৪৭ সালের পর প্রকট হতে দেখা যায়। বলা যায় ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জাতীয়তাবাদ স্পষ্টতা লাভ করে।

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, ১৯৪৭ সালের পূর্বে বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে একটা দ্বন্দ্ব কাজ করত। তবে সেসময় বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে বাঙালিত্বের ভাবনা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে এলেও পাকিস্তান আন্দোলনের কারণে অবাঙালি ও বাঙালি মুসলমানের দ্বন্দ্বটি প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির কিছুদিন পর পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলার মুসলিম মানসে আবার বাঙালি জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু কেন তৎকালীন পূর্ববাংলার মুসলমান জনমনে আবার বাঙালি জাতীয়তাবোধের সঞ্চার ঘটল এবং কীভাবে ঘটল– সে সম্পর্কে নিজস্ব পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করেছেন যতীন সরকার। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম বাংলার মুসলমানের মাতৃভাষায় আঘাত করেছিলেন। কিন্তু যতীন সরকার বলেন : 'যে কোনো জনগোষ্ঠীর প্রাণবীজ নিহিত থাকে তার সংস্কৃতির মধ্যে।' (২০১২গ : ৩৯)। বলাবাহুল্য ভাষা ছিল পূর্ববাংলার মুসলিম জীবনের সংস্কৃতির সেই প্রাণবীজ– যা একইসঙ্গে উপরিকাঠামো ও অবকাঠামোর যোগসূত্র। জিন্নাহ এই আঘাতের মাধ্যমে মুসলমান জনমনে আত্মজাগরণের সঞ্চার ঘটালেন। এর তীব্র প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী একে প্রতিহত করার জন্যে পূর্বতন মুসলিম জাতীয়তাবাদের সঞ্চার ঘটানোর লক্ষ্যে নতুন কৌশল অবলম্বন করেছিল। বাংলায় ঘন ঘন দাঙ্গা দেখা দিতে থাকল এবং হিন্দুরা ক্রমান্বয়ে দেশছাড়া হতে লাগল। কিন্তু শুভবুদ্ধির মানুষ এর প্রতিক্রিয়ায় সচেতন হয়ে উঠতে থাকে এবং তারা জাতীয়তাবাদী চেতনায়ও বিকশিত হতে থাকে। ফলে জিন্নাহর মৃত্যুতে বাংলার মুসলিম মানসে একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। সেসময় বাংলার মুসলমান বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় সচেতন হতে শুরু করেছে মাত্র। পাকিস্তান রাষ্ট্রে হিন্দুদের ক্রমাগত মানসিক যন্ত্রণা যেমন একদিকে বেড়েই যাচ্ছিল, তেমনি অন্যদিকে দেশত্যাগ ও তার প্রস্তুতি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছিল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করলে অবাঙালি ও বাঙালি মুসলমানের মুসলিম জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা দৃঢ়তা লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে জিন্নাহর এই ঘোষণাই পরবর্তীকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংকটকে অনিবার্য করে তোলে। বাঙালির এই জাতীয়তাবাদী সচেতনতা পাকিস্তানি প্রতিক্রয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ১৯৫০ সালে সৃষ্ট দাঙ্গার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কৌশলে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভাবাবেগ দ্বারা মুছে দিতে চায়।

যতীন সরকার বলেন, পাকিস্তানের জন্মদাতা মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মৃত্যুবীজ বপন করেছেন। গ্রন্থকার বলেন : "এখন মনে হয় : যে জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তানের জন্মদাতা, সেই জন্মদাতাই আটচল্লিশের মার্চে 'উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে' বলে এ রাষ্ট্রটির মৃত্যুবীজও আপন হাতে রোপন করে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের ঢাকায় এসে।" (যতীন সরকার ২০০৫ : ১০৮)। এসময় ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি মুসলমানের মনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সচেতন হয়ে উঠলে ১৯৫০ সালে ষড়যন্ত্রমূলক দাঙ্গার সৃষ্টি করে কৌশলে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে মুছে দিয়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভাবাবেগ সৃষ্টি করা হয়। লেখক বলেন, ছেচল্লিশের দাঙ্গা শুধু নোয়াখালিতে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু পঞ্চাশের দাঙ্গা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এ দাঙ্গা হিন্দুদের দেশত্যাগে বেশি প্রভাবিত করেছিল। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পরিণাম ছিল হিন্দুদের অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণা ও দেশত্যাগ। ১৯৫০ সালের দিকে 'Save Bangals From the Clutches of Riot Mongers' নামে ইংরেজিতে লিখিত একটি দাঙ্গাবিরোধী ইশতেহার সরাসরি 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনে'র নামে প্রচারিত হয়। সেখানে বলা হয় 'দুই বাঙলাই সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার কবলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। আরও অধিক সংখ্যক হয়েছে গৃহহীন। যারা মৃত্যুকে এড়াতে পেরেছে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করেছে। দ্বিতীয়টির প্রস্তুতি এখন চলছে উন্মুক্ত গতিতে।' (বদরুদ্দীন উমর ২০১১ : ২৮৩)। দাঙ্গার পরিণামে হিন্দুদের যেমন জীবন সংশয় হয়ে উঠেছিল, তেমনি মানসিক যন্ত্রণা বেড়ে গিয়েছিল। দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচতে হিন্দুরা ভারত রাষ্ট্রের সাহায্য কামনা করত। এ যেন ছিল নিজভূমে পরবাসী ও বহিঃরাষ্ট্রীয় আনুগত্য। পঞ্চাশ সালের দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে লেখকের মনে একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জিন্নাহ পাকিস্তান চেয়েছেন, জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪) তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অর্থাৎ জিন্নাহ-জওহরলাল নেহেরুর স্বীকৃতিতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। লেখকের প্রশ্ন : "এরকম একটি নীতিবর্জিত আপস যখন তাঁরা করলেনই, তখন তারা দু'রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের বিনিময় করে সে-আপসরফাকে সম্পূর্ণতা দিলেন না কেন?" (যতীন সরকার ২০০৫ : ১২৩)। অর্থাৎ দুই রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু হিসাবে পাকিস্তানে হিন্দু ও ভারতে মুসলমানেরা পণ-বন্দিদের মত যন্ত্রণাভোগ করছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব লেখকের মতে, পাকিস্তান বা ভারতের রাষ্ট্রনেতারা কোনোদিনই দেননি এবং দেবার প্রয়োজনও মনে করেননি।

পঞ্চাশের দাঙ্গা থেমে গেলে ভাষার আন্দোলন আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রগতিশীল বাঙালি সচেতন হয়ে ওঠে আত্ম-অধিকারে। ফলে বায়ান্নতে দেশের সকল স্তরে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিস্তার লাভ করে। 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন ছিল মুখ্যত একটি জাতীয় সংগ্রাম।' (আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ ১৯৯০ : ৮)। ১৯৫০ সালে দাঙ্গার ষড়যন্ত্র দ্বারা বাঙালি ভাবাবেগ মুছে দেয়ার চেষ্টা করলেও বাংলার মুসলিম মানসে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাও সক্রিয় থাকে। বাঙালি মুসলমান ভাষার প্রশ্নে সোচ্চার থাকে। অন্যদিকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিকে তার রাষ্ট্রীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ষড়যন্ত্র করে চলে। এ দু'য়ের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের মুসলিম সমাজ ক্রমান্বয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠতে থাকে এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সচেতন ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদ থেকে বের হয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

বাঁচার সংগ্রামের সঙ্গে সংস্কৃতির সংগ্রাম অভিন্ন হলেই বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে সংস্কৃতির অবয়বের তিনটি ভাগ দেখা দেয় বলে মনে করেন যতীন সরকার। এর প্রথম ভাগে জীবনসংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ; দ্বিতীয়ভাগে, সমাজযাত্রার বাস্তবব্যবস্থা; আর তৃতীয় ভাগে থাকে মানস-সম্পদ। এই তৃতীয় প্রত্যয়টি অর্থাৎ মানস-সম্পদরূপে আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, সাহিত্য, চারুকলা ইত্যাদি

প্রচলিত অর্থে সংস্কৃতি। সংস্কৃতির আলোচনা সাধারণত এ প্রত্যয়টির মধ্যেই সীমায়িত। এ কারণেই সংস্কৃতির সঙ্গে সংগ্রামের সম্পর্কটি অনুপলব্ধ থাকে প্রায়শই। এ সম্পর্কটির সম্যক উপলব্ধির জন্যই প্রয়োজন মানস-সম্পদের ভিত্তিরূপে জীবনসংগ্রামের বাস্তব উপকরণ আর সমাজযাত্রার বাস্তব অবস্থাকে চেতনায় সদাজাগ্রত রাখা। মানস-সম্পদ সংস্কৃতি হিসাবে গ্রাহ্য হলেও এর সঙ্গে সংগ্রামের অবিচ্ছিন্নতার বিষয়টি স্পষ্ট ও তীক্ষ্ম। (যতীন সরকার ১৯৮৮ : ২৭)।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বাংলা ভাষার ওপর আঘাত বাংলার মুসলমানকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি আস্থাশীল করে তোলে। অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর দাঙ্গার ষড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি মুসলমান সচেতন হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বাংলার মুসলমানকে রাষ্ট্রকাঠামোয় বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করে। এসময় বাঙালি মুসলমানের বাঙালি জাতীয়তাবাদ কেবল স্পষ্ট হয় না, মুসলিম ভাবাদর্শ থেকে পৃথক হয়ে আসে।

জিন্নাহর মৃত্যুর পর বায়ান্নের একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহর ও গ্রামের আপামর জনসাধারণের মধ্যে মুসলিম আবেগের দোলাচল নিঃশেষ হয় এবং ভাষার প্রশ্নে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সংঘটনের সুযোগ সৃষ্টি হয়– মাতৃভাষার অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে। বায়ান্ন পরবর্তী রাজনৈতিক চেতনায় যতীন সরকার লক্ষ করেন, পাকিস্তান আন্দোলনে পাকিস্তান রাষ্ট্রে যে উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন নিয়ে মুসলিম সমাজ অংশগ্রহণ করেছিল, পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার পর ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমেই তারা সেই পাকিস্তানের বিরোধিতা করে বসে। ভারতবিভক্তির মাত্র চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই বাঙালি মুসলমানের পাকিস্তানের প্রতি পূর্ব মনোভাবের পরিবর্তন হতে শুরু করে। যতীন সরকার এ প্রসঙ্গে বলেন : "তেপান্নর ফেব্রুয়ারিতেই, লক্ষ্য করলাম মানুষের কথাবার্তার ধরনধারণ যেন বদলে যাচ্ছে। একান্ন সালেও যাদের মুখে হরহামেশা 'শিশু রাষ্ট্র পাকিস্তানের লালন-পালনের' কথা শোনা যেতো, সরকারের মৃদু সমালোচনার মধ্যেও যারা পাকিস্তানের দুশমনদের চক্রান্ত দেখতো, তাদের কণ্ঠই এখন কঠোর ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।" (২০০৫ : ১৯২)। প্রাবন্ধিকের অভিমত, এই মনোভাবের মধ্যে চুয়ান্নর নির্বাচন এসে পড়ে আর সেসময় মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ বলার লোক দেখা গেল না। তেপান্ন সালেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রশ্নে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের মুসলিম গণমানুষের ভাবনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেল। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের মুসলমানেরা পাকিস্তানি পরিচয়ের পরিবর্তে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে স্পষ্ট করে তোলে। আর সেটা প্রতিষ্ঠিতও করে তৎকালীন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারের ১৯তম দফা। ১৯তম দফায় বলা হয়েছে :

> লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বশাসিত ও সার্বভৌম করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্বক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর হেকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রনির্মাণের কারখানা নির্মাণ করত পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে স্বতন্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে। (হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৮২ক : ৩৭৪)।

অন্যদিকে চুয়ান্নর নির্বাচনের পর বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকরা ষড়যন্ত্র করতে থাকে। শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। তাঁকে 'বিশ্বাসঘাতক ও পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যহীন' বলে চিহ্নিত করা হয়। (যতীন সরকার ২০০৫ : ২১০)। ফজলুল হককে গৃহবন্দি ও শেখ মুজিবসহ দেড়শোর অধিক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে সাজা দেয়া হয়। লেখক বলেন : 'সকলের অজান্তে এ-অঞ্চলে পাকিস্তানের মৃত্যুবীজটি পুষ্ট হয়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ পেয়ে গেলো।' (২০০৫ : ২১০)।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানি শাসকচক্রের ষড়যন্ত্রে পাকিস্তানকে সাংবিধানিকভাবে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হয়। ফলে সংখ্যালঘু হিন্দুরা পাকিস্তান রাষ্ট্রে দ্বিতীয়শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়। অন্যদিকে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে ১৯৫৬ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কিন্তু দেশের রাজনীতিবিদরা দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় ব্যর্থতার পরিচয় দিলে পাকিস্তানি শাসকচক্র মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানের (১৯০৫-১৯৯১) দ্বারা দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করেছিল। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারও (১৮৯৪-১৯৬৯) তাই করেছিল। যতীন সরকার বলেন যে, পূর্বপাকিস্তানে সামরিক বাহিনী ক্ষমতার স্বাদ পায় যখন ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ (১৮৯৫-১৯৫৬) গণপরিষদ বাতিল করে 'মেধা মন্ত্রী' সভা গঠন করে উক্ত মন্ত্রীসভায় সেনাধ্যক্ষ আইয়ুব খানকে (১৯০৭-১৯৭৪) প্রতিরক্ষামন্ত্রী আর কথিত জঙ্গী নায়ক ইস্কান্দার মির্জাকে (১৮৯৯-১৯৬৯) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে সেনাবাহিনীকে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় নিয়োগ দিয়ে সেনাবাহিনীকে ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল। ফলে 'এসবের মধ্য দিয়ে যেন আটান্ন সালে সেনাবাহিনীর পুরো ক্ষমতা দখলের রিহার্সাল সম্পন্ন হচ্ছিলো এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাচ্ছিল।' (২০০৫ : ২২০)। ১৯৫০-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের বাঙালি মুসলিম মানসে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল– তা নিম্নরূপে নির্দেশ করা যেতে পারে :

১. উর্দুকে বাঙালির রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম;

২. জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ১৯তম দফায় স্বায়ত্বশাসনের দাবি ও

৩. ১৯৫৮ সালের সেনা শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির আত্মজাগরণ।

এ তিনটি দিক বাঙালির সাংস্কৃতিক অবকাঠামো ও উপরিকাঠামোর আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে।
যতীন সরকার বলেন, পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশে শাসকদের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ছিল বাঙালিদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভুলিয়ে দেয়ার এবং এক ধর্মের দোহাই দিয়ে তথাকথিত পাকিস্তানি তমুদ্দুন নামে একটি কিম্ভূত পদার্থ সৃষ্টির নিরন্তর প্রয়াস কার্যকর ছিল। সংস্কৃতিক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংগ্রাম ছিল এদের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধেই। ভাষা-আন্দোলনে তার সূত্রপাত। বাংলা বর্ণমালা পরিবর্তন, বর্ণমালা সংস্কার, রবীন্দ্রবর্জন প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমেই পাকিস্তানি আমলের বাংলার সাংস্কৃতিক সংগ্রামের অগ্রগতি সাধিত হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসনাধীন বাঙালির সংগ্রাম কিন্তু সংস্কৃতির সাধারণ সংগ্রামের মত মোটেই অস্পষ্ট ও পরোক্ষ নয়, একেবারেই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। সে সংগ্রামেরই পরিণত রূপ স্বাধীনতা সংগ্রাম। স্বাধীনতা সংগ্রামেই রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক সংগ্রামের সীমারেখা অবলুপ্ত হয়ে দুই সংগ্রাম একীভূত হয়। (১৯৮৮ : ২৮-২৯)। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের বিচ্ছেদের সূচনা হয় সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। সেখানেই বাঙালি মুসলমানের প্রথম সাংস্কৃতিক এবং সেসঙ্গে অর্থনৈতিক সংগ্রামের আরম্ভ। এরপর পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক শোষণ ও নিপীড়নের নানারকম প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বাঙালি ক্রমান্বয়ে সচেতন ও প্রবল হতে থাকে। বাঙালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শোষণ প্রক্রিয়া ছিল প্রবল কিন্তু তার বিরুদ্ধে সমস্ত জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল স্পষ্ট। কিন্তু বাঙালিকে তার মর্মমূল ভুলিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র যখন প্রবল হতে থাকে, তখন বাঙালিও সচেতন হতে থাকে– যা ছিল বাঙালির সংস্কৃতিকে মুছে দেয়ার ষড়যন্ত্র। বাঙালি সচেতন হতে থাকে সংস্কৃতির আলোয়, আর রাজনীতি সেই সচেতনতাকে ধরে রাখে। ফলে বাঙালি অধিকারের দাবি আদায়ে আরও সোচ্চার হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যতই ষড়যন্ত্র করতে থাকে,

বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও সচেতনতা ততই প্রবল হয়ে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এক সময় পরাভূত হয় মুসলিম ভাবাদর্শের দ্বিজাতিতত্ত্বের ভূয়া শিক্ষা। বাঙালি বুঝতে পারে বাঙালির সাংস্কৃতিক ও আর্থিকজীবনে 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' একটি সম্পর্কহীন চিন্তা। অবশ্য এটা বাঙালি বুঝতে পারে তার সাংস্কৃতিক চেতনার শিকড় জাতির মর্মমূলে প্রোথিত থাকার কারণেই। কেননা সে চেতনা ক্রমান্বয়ে সমগ্রদেশে জেগে উঠেছিল একযোগে আর রাজনীতি সেই চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল– যা মুক্তিযুদ্ধকে সফল করেছে।

আমরা দেখেছি যে, বাঙালি তার জাতীয়তাবাদ তথা আত্মপরিচয়কে স্পষ্ট করে নিজেকে পাকিস্তানি সংস্কৃতি ও প্রতিক্রিয়াশীল চেতনা থেকে পৃথক করে নিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের বিপরীতে পুরো ষাটের দশকে পাকিস্তানি ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। দেশব্যাপী সংস্কৃতির এই ভাবাদর্শের সংগ্রাম সারা দেশের মানুষকে সচেতন করে তোলে এবং রাজনীতি বাঙালির এই মুক্তির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

সংস্কৃতির সংগ্রাম তথা ভাবাদর্শের সংগ্রাম বিস্তৃতিলাভ করে মূলত দুটি প্রক্রিয়ায়। এক. রবীন্দ্র-নজরুল সংস্কৃতির বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের বিপরীতে; দুই. ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে। অর্থাৎ পাকিস্তানি শাসকচক্রের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের ষড়যন্ত্রের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের সংস্কৃতির সংগ্রাম ক্রিয়াশীল হয়। এই সংগ্রাম ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি প্রহসন ফাঁস হয়ে গেলে তা আরও বেগবান হয়। বাঙালি সর্বত্র পাকিস্তানি মুসলিম প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের বিরোধিতা ও প্রতিরোধ করতে থাকে। এরই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণা করেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানালে বাঙালি সংস্কৃতির সংগ্রাম আরও বেগবান হয় সংগঠিত ও সংহত রূপ নিয়ে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি নেতাদের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রভৃতি ষড়যন্ত্রমূলক কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রাখলে বাঙালির রাজনৈতিক প্রক্রিয়া তখন আরও গতিশীল হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটতে থাকে। অবশেষে এই চেতনা আরও শক্তিশালী হয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে আর তা ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি মুসলিম ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে বিস্ফোরিত হয়। এই বিস্ফোরণের ফলে ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন হাতে নিয়ে মার্শাল ল জারি করে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করে।

লেখক বলেন, ১৯৬১ সালে সারা পৃথিবী জুড়ে যখন রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উদযাপনের আয়োজন চলছিল, তখন পূর্বপাকিস্তানে একটি চক্র রবীন্দ্রনাথকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার পায়তারা করছিল। পূর্বপাকিস্তানে তখন সামরিক শাসন জারি ছিল। সামরিক শাসকেরা রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উদযাপন নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালিরা নীরব থাকেনি। রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'সামরিক সরকার নিশ্চুপ থাকলেও বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা চুপ থাকেননি। তাঁরা এই স্বতঃস্ফূর্ত অনুষ্ঠানাদিতে যুক্তবঙ্গীয় প্রবণতার নিশানা এবং পাকিস্তানী আদর্শ ও ইসলাম-বিরোধী শক্তির সমাবেশ দেখতে পেয়ে প্রাণপণ বিরোধিতায় নামলেন।' (সাঈদ-উর রহমান ২০০১ : ৪৭)। পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবীর একটি দল মওলানা আকরম খাঁর *আজাদ* পত্রিকার ওপর ভর করে ব্যাপক অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছিল। (যতীন সরকার ২০০৫ : ২৫০)। তাদের বক্তব্য ছিল, রবীন্দ্রনাথ মুসলিম বিরোধী। কাজেই যারা রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী নিয়ে মাতামাতি করছে, তারাও পূর্বপাকিস্তানের ন্যায় মুসলিম রাষ্ট্রটি ধ্বংসের পায়তারা করছে বলে প্রাবন্ধিক জানান। "'আজাদে'র এই ন্যাক্কারজনক ভূমিকার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে দাঁড়ালো 'ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ'।" (২০০৫ : ২৫০)। অথচ এই *ইত্তেফাক* কাগমারি সম্মেলনকে উপলক্ষ করে একটা বিরোধী ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯৬১ সালে *আজাদ* যেমন রাষ্ট্রবিরোধী ভূমিকা নিয়েছিল, *ইত্তেফাক* সেদিন

প্রগতিবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা নিয়েছিল। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি ও প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে। লেখকের বিবেচনায় : 'যে-কারণেই হোক, রবীন্দ্র শতবার্ষিকীকে উপলক্ষ করে আজাদের তথা প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানবাদীদের রবীন্দ্র-নিন্দা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিরোধিতাকে ইত্তেফাক যে-রকম প্রশংসনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করেছিল, ভাবীকালের বাঙালিকেও তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হবে।' (২০০৫ : ২৫০)।

তাঁর মতে, ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত সময়ে দুটো ঘটনা ঘটে। একটি আইয়ুব বিরোধী ছাত্র-আন্দোলন এবং দ্বিতীয়টি এর বিপরীতে প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানি শাসক কর্তৃক দাঙ্গা সংঘটন। দাঙ্গার বিপরীতে প্রগতিশীল চেতনার বাঙালি মুসলিম সমাজ প্রতিরোধ ও লড়াই করে। ঠিক এসময় ১৯৬২ সালে সাহিত্যপত্র *পূর্বমেঘ*-এ 'দ্বিজাতিতত্ত্ব যে একটি ভূয়া তত্ত্ব'– মার্কসীয় দৃষ্টির আলোকে বদরুদ্দীন উমর সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন (১৯২০-১৯৯৫), সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪-১৯৯৮), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) বদরুদ্দীন উমরের বক্তব্যের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছিলেন বলে লেখক জানান। সেদিন তাঁরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্যদিকে প্রখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা খোকা রায় (১৯০৭-১৯৯২) *সংগ্রামের তিন দশক* (২০০৮) গ্রন্থে বলেছেন যে, তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান ঐ সময়ে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের দিকে এগুচ্ছিল। কম্যুনিস্ট পার্টি সেই এগিয়ে যাওয়াকে প্রগতিশীল ও ইতিবাচক ঘটনারূপে গ্রহণ করেছিল বলে যতীন সরকার জানান। প্রাবন্ধিক বলেন, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ "জীবনের এক পর্যায়ে এসে ব্যক্তিক উচ্চকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে নিজেকে তিনি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ 'মুসলমান' কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্র হলেন। আবার অগণিত দলিত ও নির্যাতিত মুসলমানের মনে স্বপ্ন জাগিয়ে তাদেরকে সাম্প্রদায়িকভাবে সংঘবদ্ধ করে তুললেন এবং নিজেই পাকিস্তান নামক বিষবৃক্ষটির জন্ম দিলেন।" (২০০৫ : ২৮২)। এ ঘটনার পর জিন্নাহকে যতই অসাম্প্রদায়িক করে দেখানো হোক না কেন, তিনি যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপন করেছেন, তা থেকে কখনোই অমৃত ফলের আশা করা যায় না। ১৯৪৮ সালের মার্চে ঢাকায় এসে হিন্দুদের উদ্দেশ্য করে জিন্নাহ বলেন, পূর্ববাংলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা তারা পরিত্যাগ করেনি এবং এখনো পর্যন্ত সেটাই তাদের লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, 'আমরা বাঙালি বা সিন্ধি বা পাঠান বা পাঞ্জাবি– একথা বলার প্রয়োজন কি? না, আমরা সকলেই হলাম মুসলমান।' (২০০৫ : ২৮২)। লেখক মনে করেন, জিন্নাহর ভাষণে এটা স্পষ্ট যে, তৎকালীন পাকিস্তানে মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্ম বা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের নাগরিক অধিকারকে তিনি স্বীকার করতে চাননি। জিন্নাহর মতে : 'এখানকার সকল অমুসলমানরাই দেশদ্রোহী। যে মুসলমান বাঙালি ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারের কথা বলে তারা বিভ্রান্ত এবং এই অমুসলমানরাই তাদের বিভ্রান্ত করেছে। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা ছেড়ে দিলে পাকিস্তানের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না– পাকিস্তানের জনক মহোদয় প্রকারান্তরে একথাই বলে গেলেন।' (২০০৫ : ২৮২)। ফলে জিন্নাহ যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবর্তন করে গেলেন, তাঁর উত্তরসূরিরা সেই পথেই সাম্প্রদায়িক চরিত্র দ্বারা বাংলা শাসন করার নীতি গ্রহণ করেছিল। ১৯৬৪ সালের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে গ্রন্থকার লেখেন : "এবারই সর্বপ্রথম এখানকার রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সমাজকর্মী, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং সচেতনশ্রেণির সমাজ সকলে মিলে সমস্বরে আওয়াজ তুললেন– 'বাঙালি রুখিয়া দাঁড়াও'।" (২০০৫ : ২৮৩)। এসময় বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিস্তৃত হতে থাকে। এদিকে পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানি শাসকচক্র কৌশলে পাক-ভারত যুদ্ধ বাঁধিয়ে ভারতবিরোধী সাম্প্রদায়িকতাও তৈরি করার চেষ্টা করতে থাকে। লণ্ডনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় দেয়া একটি ইশতেহারে শেখ মুজিব অভিযোগ করেন : 'তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক ব্যবস্থা ও শক্তি খুবই দুর্বল রাখার কারণে যুদ্ধের সময়

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।' (এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া ১৯৯৩ : ২৩)।

আসলে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানিরা কাশ্মীরি মুসলমানদের জন্য যুদ্ধ শুরু করেছিল। এটা তারা করেছিল ইসলাম রক্ষার নামে। '১৯৬৫ সালে সামরিক শাসক আয়ুব খান ধর্মীয় জিগির তুলে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়।' (মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ২০০৩ : ৬৬)। কিন্তু এদিকে পূর্বপাকিস্তানকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখেছিল– এ ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলে এদেশের মুসলমান বাঙালিদের অবশিষ্ট পাকিস্তান-প্রেম ও বিশ্বাস সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ণমাত্রায় জেগে ওঠে। এর পটভূমিতে পরের বছর বঙ্গবন্ধু ছয় দফা ঘোষণা করেন বলে লেখক জানান। তবে ভিন্ন মত এই যে : 'দিনের পর দিন অর্থনৈতিক বঞ্চণা ও নিপীড়নের চালচিত্র থেকে ৬-দফা সৃষ্টি হয়েছিল।' (মোহাম্মদ হাননান ২০০৬ : ৩০৭)। এরপর লেখক বলেন, ১৯৫৬ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির অধিবেশনে একজন কমরেড পূর্ববাংলার স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। লেখক অবশ্য সে ব্যক্তিটির নাম বলেননি। আবার ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের কাগমারি সম্মেলনে মওলানা ভাসানী 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়ে দেবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। লেখকের মতে, ১৯৫৮ সালেই কিছু দুঃসাহসী তরুণ 'পূর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট' গঠন করে বাঙালির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

১৯৬১ সালের অক্টোবরে অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান (জ. ১৯৩৫) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুই অর্থনীতি সুপারিশ করেছিলেন। তবে যতীন সরকার মনে করেন, ছয় দফার যে প্রভাব– তার ব্যাপকতা, গভীরতা ও প্রচণ্ডতা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী– যা এর পূর্বে অন্য কোনো বক্তব্যে দেখা যায়নি। লেখক জানান, ১৯৬২ সালেই শেখ মুজিব কম্যুনিস্ট পার্টির গোপন বৈঠকে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি কম্যুনিস্ট নেতাদের কথায় ধৈর্য ধরেছিলেন। আর সুযোগ বুঝে ১৯৬৬ সালে ছয় দফা প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ছয় দফা ঘোষণা করলে পিকিংপন্থি কম্যুনিস্ট পার্টি ছয় দফার বিরোধিতা করে কিন্তু রুশপন্থিরা তা সমর্থন করে। কম্যুনিস্ট পার্টি ছয় দফাকে অসম্পূর্ণ বলেছিল। তারা আরও পাঁচটি দফা যুক্ত করে। লেখকের অভিমত : 'এগার দফা বাঙালির জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েই একদিন স্বাধীনতার এক দফায় রূপ নেয়। পাকিস্তানের মৃত্যু ও বাংলাদেশের জন্ম অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।' (যতীন সরকার ২০০৫ : ৩০১)। কেননা এই ১১ দফায় দেশের সমস্ত জনগণের চেতনার প্রতিফলন ঘটেছিল। 'এই ১১ দফা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়।' (ফাহিমুল কাদির ১৯৯৯ : ১৫২)।

গ্রন্থকার বলেন, ষাটের দশকে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে রাজনীতির পাশাপাশি ভাবাদর্শের সংগ্রাম ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। আঞ্চলিকভাবেও এ সংগ্রামের সচেতনতা তৈরি হয় সেসময়। এ সংগ্রামে অংশীদাররাই পরে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। প্রকৃতপক্ষে আটান্নর সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর থেকেই প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির ভাবাদর্শ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং ব্যাপকভাবে সারাদেশে এ সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে সনৎকুমার সাহা (জ. ১৯৪১) তাঁর "আজকের সাম্প্রদায়িকতা" প্রবন্ধে লিখেছেন : 'বাংলাদেশে ষাটের দশক ছিল পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংহত ও প্রতিবাদে বিদ্রোহে বিস্ফোরিত হবার উত্তাল সময়।' (১৯৯৯ : ১৩৮)। যতীন সরকারের মতে, ষাটের দশকে দেশে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তে দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত গড়ে উঠেছিল। এই প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের ব্যাপ্তি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন এদেরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন অনেক প্রগতিশীল বাঙালি ব্যক্তি। আঞ্চলিকভাবে এরা মোকাবেলা করেছিলেন প্রতিক্রিয়াশীলদের। এই অজ্ঞাত সৈনিকরাই পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে।

প্রাবন্ধিক জানান, ঊনসত্তরে ছাত্ররা এগার দফা ঘোষণা করে। ঘোষণায় বাঙালি জাতির স্বাধীনতার কথা প্রতিফলিত হয়। বঙ্গবন্ধু এ ঘোষণাকে সমর্থন করেন। তখন দেশের সর্বত্র অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। শেখ মুজিব আগরতলা মামলা থেকে রেহাই পান। রেসকোর্স ময়দানে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ (জ. ১৯৪৩) শেখ মুজিবকে এক সংবর্ধনা সভায় 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর মতে, ঊনসত্তরে দেশের জনগণ সর্বত্র পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়াশীল কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একযোগে। এই আত্ম-উন্মেষ না ঘটলে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা হতে পারত না। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৯ থেকে ১৯৭০ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এতটাই শক্তিশালী আকার ধারণ করে যে, বাঙালি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে দ্বিধা করে না।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে শাসক ও শোষক থাকে। শাসক ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আর তাদের সৃষ্ট মুক্তিযুদ্ধবিরোধী দালাল-রাজাকাররা প্রতিক্রিয়াশীল শোষকের ভূমিকায় ছিল। অন্যদিকে শোষিত বাঙালি ছিল প্রগতিশীল চেতনার ধারক। অসাম্প্রদায়িক বাঙালির সংস্কৃতি চেতনাই বাঙালিকে প্রগতিশীলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কবীর চৌধুরীর (১৯২৩-২০১১) অভিমত উল্লেখযোগ্য : 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশে এই অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতির চেতনা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।' (১৯৯৭ : ২৫)। শোষণ ও প্রতিরোধের দ্বন্দ্বে শোষিত ও নিপীড়িতের জয় ছিল নিশ্চিত কিন্তু সেসময় প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের ছিল বিভিন্ন মাত্রা। এদের কেউ নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং সুযোগ বুঝে স্বাধীনতার পর আবার প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকায় মুক্তিযুদ্ধবিরোধী চেতনার পক্ষে কাজ করেছে। ১৯৭১ সালে যে পাকিস্তানি শক্তি নিহত হয়েছিল পরবর্তীকালে আবার সেই শক্তি ভূত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘাড়ে দেখা দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের অপর উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির ঐক্য ও সম্মিলিত সংগ্রাম– যা মুক্তিযুদ্ধকে সম্ভব করেছে।

১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতার লড়াই ছিল শাসক ও শোষিতের লড়াই। স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল শোষিত ও বঞ্চিত জনগণ। দলমত নির্বিশেষে সকলেই এক কাতারে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে। 'জনযুদ্ধ বা People's War বলতে আমরা যা বুঝি সেই সংজ্ঞাতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সত্যিকার অর্থেই একটি অনন্য জনযুদ্ধ ছিল।' (এইচ. টি. ইমাম ২০০৪ : ২৮)। ভাবাদর্শের সংগ্রামে প্রগতিশীল সংস্কৃতির কাছে প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি পরাভূত হয়। প্রগতিশীল সংস্কৃতি এগিয়ে যায়– আর সেসঙ্গে রাজনীতিকে সঠিক ও দ্রুততার সঙ্গে চালিত করে প্রগতিশীল সংস্কৃতি। যতীন সরকার বলেন যে, জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির মিলিত ঐক্যেই মুক্তিযুদ্ধ সফল পরিণতি পায়। কিন্তু পাকিস্তানের পরাজিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নানা মাত্রিকতায় ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকে। প্রাবন্ধিক জানান যে, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই ময়মনসিংহবাসী মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। (যতীন সরকার ২০০৫ : ৩৬২)। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন কি-না সে প্রসঙ্গে যতীন সরকার বলেন :

> ছাত্রকর্মীরা ট্রাকে করে সারাদিন ধরে মাইকে করে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি প্রচার করে চললো। পঁচিশে মার্চের রাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু যে বার্তাটি ইপিআর-এর ওয়ারলেসযোগে চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিলেন সেটি ছাব্বিশ তারিখেই ময়মনসিংহেও পৌঁছে গিয়েছিলো। সেদিন ছাত্রলীগের কর্মীদের পাশে সেই বার্তা প্রচার করতে দেখলাম এনএসএফ কর্মীদেরও। (২০০৫ : ৩৬২)

তাঁর অভিমত, ২৬শে মার্চ তারিখে ময়মনসিংহ শহরের মহাকালী পাঠশালার ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা গোপনে কম্যুনিস্ট পার্টি ও মোজাফ্ফর-ন্যাপের কর্মীদের সঙ্গে মিলে একটি কন্ট্রোলরুম স্থাপন করে

এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সকল কার্যক্রম সেখান থেকে পরিচালনা করে। যতীন সরকার জানিয়েছেন : 'সাতাশ তারিখেই সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার থেকে মেজর জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা শুনলাম।' (২০০৫ : ৩৬৩)। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অজয় রায়ের (জ. ১৯৩৫) বক্তব্য : '২৬ মার্চের গভীর রাত্রে বিদেশের বিভিন্ন বেতার চ্যানেল ঘুরাতে ঘুরাতে হঠাৎ করেই রেডিও অস্ট্রেলিয়ার একটি বেতার কেন্দ্রের ঘোষণায় শুনতে পেলাম যে, শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে এখন গৃহযুদ্ধ চলছে।' (২০০৯ : ১২)। ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সেনাদের রাতের আক্রমণের পর মেজর শফিউল্লাহ (জ. ১৯৩৪) দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে বিদ্রোহ করেন এবং ময়মনসিংহ চলে আসেন। স্বাধীনতার বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধের দলিলে বলা হয়েছে যে, গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান রাইফেলস্-এর ওয়ারলেস ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে পূর্ববাংলায় সর্বত্র প্রচারের জন্য চট্টগ্রামে নিম্নলিখিত বার্তাটি প্রেরণ করেছিলেন :

> এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আমাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারির মোকাবেলা করার জন্যে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। (হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৮২খ : ১)

প্রাবন্ধিকের মতে, চিন পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা জঘন্যতম পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞকে সমর্থন ও সাহায্য করেছে। কিন্তু এদেশের বামপন্থি নেতারা চিনের বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে কম্যুনিস্টদের সংযোগের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কিন্তু তাদের মধ্যেকার সংযোগের গুরুত্ব ও তাৎপর্যটি অনেকেই ধরতে পারেননি। অথচ 'একজন বাঙালি কথাশিল্পীর ভেতর এ বোধের জাগরণ ঘটেছিলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শুরুতেই। এই কথাশিল্পীর নাম আনোয়ার পাশা।' (যতীন সরকার ২০০৫ : ৪৫২)। তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টার দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন যে, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ সফল হবেই। যতীন সরকার জানান, একাত্তরের যুদ্ধের তৃতীয় সপ্তাহেই আনোয়ার পাশা (১৯২৮-১৯৭১) *রাইফেল রোটি আওরাত* (১৯৭৩) উপন্যাসটি লেখা শুরু করেন। তাঁর উপন্যাসের নায়ক সুদীপ্ত– যে কি-না জীবন বাঁচানোর তাগিদে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় পালিয়ে বেড়ায়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ। অবশেষে সুদীপ্ত পরিচিত হয় জাতীয়তাবাদী চরিত্র কামাল আহমেদ ও কম্যুনিস্ট নেত্রী কমরেড বুলার সঙ্গে। সুদীপ্ত দেখতে পায় তাদেরও কর্ম-চিন্তা একই লক্ষ্যাভিসারী এবং সেই লক্ষ্য হল বাংলাদেশের মুক্তি-স্বাধীনতা। সেদিন ঔপন্যাসিকের মনে হয়েছিল : 'বেশি দূর তো হতে পারে না। মাত্র এই রাতটুকু তো? মা ভৈঃ। কেটে যাবে।' (আনোয়ার পাশা ১৪১৯ : ১৮০)। তাঁর ভাবনার ছয় মাস পর রাত কেটে গিয়েছিল। ঔপন্যাসিক তা চোখে দেখে যেতে পারেননি। তিনিই সত্যিকারভাবে বুঝেছিলেন– স্বাধীনতাযুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে বামপন্থি তথা কম্যুনিস্টদের সম্মিলিত প্রয়াস সহজ করবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ। বাস্তবে তা-ই হয়েছিল। পূর্বপাকিস্তান তথা পূর্ববাংলা ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হল। কিন্তু এ কোন বাংলাদেশ? বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (জ. ১৯৩৬) এ প্রসঙ্গে বলেন : 'বাংলাদেশের সেক্যুলারিজমের উদ্ভব একপক্ষে যেমন পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখান করেছে, অপরপক্ষে তেমনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদকেও প্রত্যাখান করেছে।' (২০০৫ : ২৬)।

সংস্কৃতি ও রাজনীতি সমাজজীবনে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বাঙালির রাজনীতি সংস্কৃতির হাত ধরে এগিয়ে গিয়েছিল। এটা শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সত্য নয়। পরবর্তীকালে পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবন বিশ্লেষণ করেও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেখানকার চিন্তাশীল মনীষীরা। '১৯৪৭ সালে দেশবিভাগোত্তর পূর্ববাংলায় সূচিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় পশ্চিম বাংলার

সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও। সে-দেশের রচনা পর্যালোচনা করে রথীন চক্রবর্তী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, (১) সাংস্কৃতিক জীবন রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; (২) রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কিত।' (সাঈদ-উর রহমান ২০০১ : ৭৩)। বাঙালির সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শ এই প্রক্রিয়াটির মূল নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, বাঙালির সাংস্কৃতির আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সচেতন করে এবং রাজনীতি বাঙালির আত্ম-অধিকারের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ হিসাবে সংস্কৃতি ও রাজনীতি বাঙালি জীবনে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বাঙালির রাজনীতি সংস্কৃতির হাত ধরে এগিয়ে গিয়েছিল। যতীন সরকারের বর্ণনায় নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের রাজনীতির একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াগত চরিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বাঙালির সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শ এই প্রক্রিয়াটির মূল নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। পাকিস্তানি শাসকদের আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি সংস্কৃতির চেতনা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় তাই বাঙালির সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শের বিজয়। ১৯৪৮ সালের ভাষা-আন্দোলনের বিপরীতে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রথম বাঙালি মুসলমানকে প্রতিহত করলেও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ সচেতন হয়ে ওঠে। সেই আদর্শই বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বাঙালি জীবনে আরও উজ্জ্বল হয় এবং ১৯৭১ সালে তা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। এভাবে একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শের বিজয় ঘটে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র

অজয় রায় (২০০৯), "আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়", *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান*, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ (১৯৯০), "একটি তাত্ত্বিক কাঠমোর সন্ধানে", *ভাষা-আন্দোলন : পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার*, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

আনোয়ার পাশা (১৪১৯), *রাইফেল রোটি আওরাত*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা

আবদুল হক (২০১৬), "কলিকাতায় এবং অন্যত্র হত্যাকাণ্ড", *আমার জীবন কথা স্মৃতিকথা ও দিনলিপি*, (সম্পাদক : আহমদ মাযহার), কথাপ্রকাশ, ঢাকা

আবদুল হাকিম (১৯৮৯), "আল্লাহর স্তুতি : গ্রন্থ মাহাত্ম্য", 'নূরনামা', *আবদুল হাকিম রচনাবলী*, (সম্পাদক : রাজিয়া সুলতানা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৯৭৩), "সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নবপর্যায়", *কালের যাত্রার ধ্বনি*, খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানী, ঢাকা

আবুল মনসুর আহমদ (২০১৫), *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা

এইচ. টি. ইমাম (২০০৪), "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : জনযুদ্ধ", *বাংলাদেশ সরকার* ১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

এনায়েতুর রহিম (২০০১), *বাংলায় স্ব-শাসন* (১৯৩৭-১৯৪৭), মূল গ্রন্থ : *Provincial Autonomy in Bengal* (1937-1943), (অনুবাদ : জাকারিয়া সিরাজী), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া (১৯৯৩), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

কবীর চৌধুরী (১৯৯৭), "বাঙালি জাতীয়তাবাদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা", *স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী*, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা

ফাহিমুল কাদির (১৯৯৯), "ঊনসত্তরের অভ্যুত্থানে গণমানুষের ভূমিকা", *আবহমান বাংলা*, (সম্পাদক : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম), অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

বদরুদ্দীন উমর (২০১১), "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১৯৫০", *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* ২, সুবর্ণ, ঢাকা

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (২০০৫), "রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও বাংলাদেশের ইতিহাস", *ইতিহাস নির্মাণের ধারা*, সুবর্ণ, ঢাকা

মোহাম্মদ হাননান (২০০৬), "বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৯৫৩-১৯৬৯", *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস* (১৮৩০ থেকে ১৯৭১), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

মোহাম্মদ শাহ (২০০০), "বাঙালী জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি", *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১), (তৃতীয় খণ্ড), (সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০০৩), "স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার", *মুক্তিযুদ্ধ ও আজকের বাংলাদেশ*, অনন্যা, ঢাকা

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (২০০০), *ভারত স্বাধীন হল*, মূল গ্রন্থ : *India Wins Freedom*, (অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়), ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা

যতীন সরকার (১৯৮৮), *সংস্কৃতির সংগ্রাম*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা

(২০০৫) *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন*, সাহিত্যিকা, ঢাকা

(২০১২খ), *বিচিত্রবিধ বিচার বিবেচনা*, ভূমিকা, ঢাকা

(২০১২গ), *আমার যেটুকু সাধ্য*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

সনৎকুমার সাহা (১৯৯৯), "আজকের সাম্প্রদায়িকতা", *বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি : ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কট*, (সম্পাদক : সৈয়দ আমীরুল ইসলাম ও কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

সাঈদ-উর রহমান (২০০১), *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন* (১৯৪০-১৯৮২), অনন্যা, ঢাকা

স্বনাম গুপ্ত (২০০৯), "যতীন্দ্র পরিক্রমা", *জলদ*, (সম্পাদক : স্বপন ধর), উত্তরকাণ্ড (প্রথম সংখ্যা), জ্ঞানকীর্তন, ঢাকা

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৮২ক), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* (প্রথম খণ্ড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

(১৯৮২খ), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* (তৃতীয় খণ্ড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

Sen Shila (1976), *Muslim Politics in Bengal* (1937-1947), Inpex India, Delhi

[Abstract : In India the Muslim's aspiration for separates dominion, stimulated by the then British rulers, brought about the partition of India in 1947. After 1947 The then Pakistani rulers began to dominate over the Bangalees of East Pakistan. They declared Urdu as a state Language of East Pakistan. At this, Then the idea of Bangalee nationalization grew in the mind of Bangalee Muslims in East Pakistan. The then Pakistani rulers deprived the Muslim Bangalees of their right to power of the state. Consequently there strongly grew Bangalee Muslims and got Pakistani nationalism apart. In the decade of sixty all along a fight for idiology of Bangalee nationalism was going on. Jatin Sarkar shows that the Bangalee peoples fight proceeded to a dialectic process. In consequence in 1969 there happened a mass-quoue that serves the Bangalees as a preparation of the war of Independent of 1971. Jatin Sarkar thinks that, through a dialectical process, the idiology of Bangalee nationalization won the victory of war of independence of 1971's. These types of thoughts about politics of the miscellanists are discussed in this article.]